ভয়ের চেয়ে ভয়ংকর

ভয়ের চেয়ে ভয়ংকর

সম্পাদনা : পরাগ ভূঞ্যা

বইবন্ধু

Bhoyer Cheye Bhoyonkor
Collection of horror short stories
Edited by Parag Bhunia

Published by Boibondhu Publications Private Limited
26/2 Surya Sen Street, Kolkata 700009

© Boibondhu Publications Private Limited

ISBN 978-81-967559-0-4

প্রচ্ছদ : ইন্দ্রজিৎ কর্মকার
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০২১
প্রথম বইবন্ধু সংস্করণ : নভেম্বর, ২০২৩

প্রকাশক
বইবন্ধু পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ
২৬/২ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
আলাপন ৮৬১৭৩৮১০৯৫
www.boibondhupub.com

মুদ্রক : গৌরাঙ্গ বাইন্ডার্স,
৩৮ এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য : ৪৫০/-

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ প্রতিলিপি বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ভূ মি কা

ভয়! ভয় কী? কেন?

ব্রিটিশ লেখক হোরেস ওয়ারপুল একবার বলেছিলেন— 'আমরা সবাই যেন আমাদের ভয়ের খেলার সামগ্রী।' কারো অন্ধকারে ভয়, কারো ভয় দৈহিক যন্ত্রণা, কেউ ভয় পায় জনতার বিদ্রুপকে। ঘটনা হল মানুষ মাত্রই ভীতু। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বিড়াল দেখলেই ভয় পেতেন। মিকি মাউসের স্রষ্টা ওয়াল্ট ডিজনি নিজেই মারাত্মক ভয় পেতেন পুঁচকে ইঁদুরকে। আর বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন অন্ধকারকে এত ভয় পেতেন যে বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করে ফেললেন।

ভাবছেন শুরুতেই কেন এত জ্ঞান বিতরণ? কারণ এই বইটা আর পাঁচটা বাজার-চলতি ভূতের গল্পের বই নয়। সম্পাদক হিসেবে প্রায় বছর দুই ধরে গল্পগুলি সংগ্রহ করেছি। সাইকোলজিক্যাল হরর, গথিক হরর, অকাল্ট হরর, মার্ডার মিস্ট্রি, সাই ফাই, লাভক্রাফটিয়ান হরর— পাঠক হিসেবে আপনি ভয়াল সাহিত্যের প্রায় সব উপধারার স্বাদ পাবেন।

বইটি নির্মাণের পেছনে এত মানুষের অবদান রয়েছে যে বলে শেষ করা যাবে না। তবে একজনের কথা না বলেই নয়, সুলেখক ও খ্যাতনামা সম্পাদক শ্রী সুদীপ দেব। কেবলমাত্র বইটির বানান সংশোধন নয়, বইটির সামগ্রিক দৃষ্টিনন্দন সজ্জায় তাঁর ভূমিকা অপরিসীম।

হে পাঠক, পাঠ শুভ হোক।

—পরাগ ভূঞ্যা

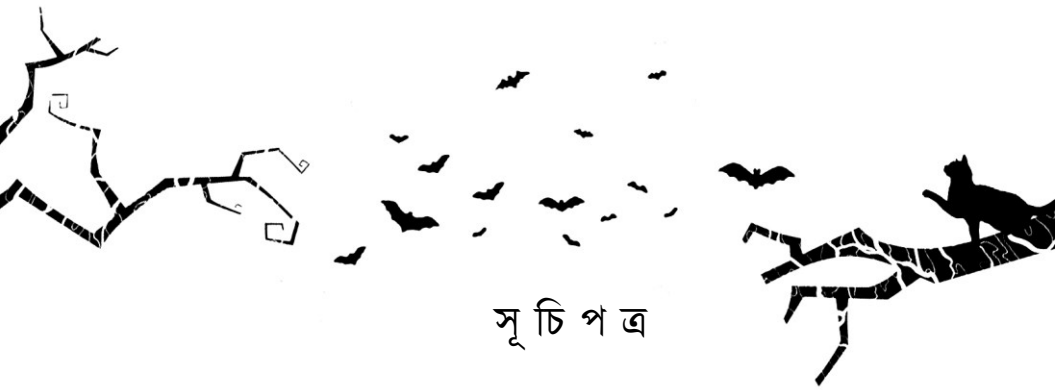

সূ চি প ত্র

উল্কাপাতের মাঠ	সৈকত মুখোপাধ্যায়	৯
মাকড়	ঋজু গাঙ্গুলী	২৭
শ্রোডিংগারের বেড়াল	পার্থ দে	৪৫
শোভনের ফটো	চুমকি চট্টোপাধ্যায়	৫১
ছাদ	মনীষ মুখোপাধ্যায়	৬১
অনেকটা গল্পের মতোই	সুদীপ দেব	৭৫
মাঝরাতের অতিথি	অর্ঘ্য দত্ত	৮১
অভিযোজন	ঐষিক মজুমদার	৯১
পাথর	অভিজ্ঞান গাঙ্গুলী	১০৫
মোহ	লুৎফুল কায়সার	১১৭
আঙরা আইনু	রাজীব চৌধুরী	১২৭
ডাক	দেবলীনা চট্টোপাধ্যায়	১৩৯
ঝুল	অর্ঘ্যজিৎ গুহ	১৫৭
প্রতিস্পর্ধী	রাকা বসু	১৭১
অশনি সংকেত	রানা মুখার্জি	১৮৩
দ্য ডেথ গেম	রাজর্ষি গোস্বামী	১৯১
মায়াবিল	রাহুল দাস	২০৫
সাইরেন	পরাগ ভূঞ্যা	২১১

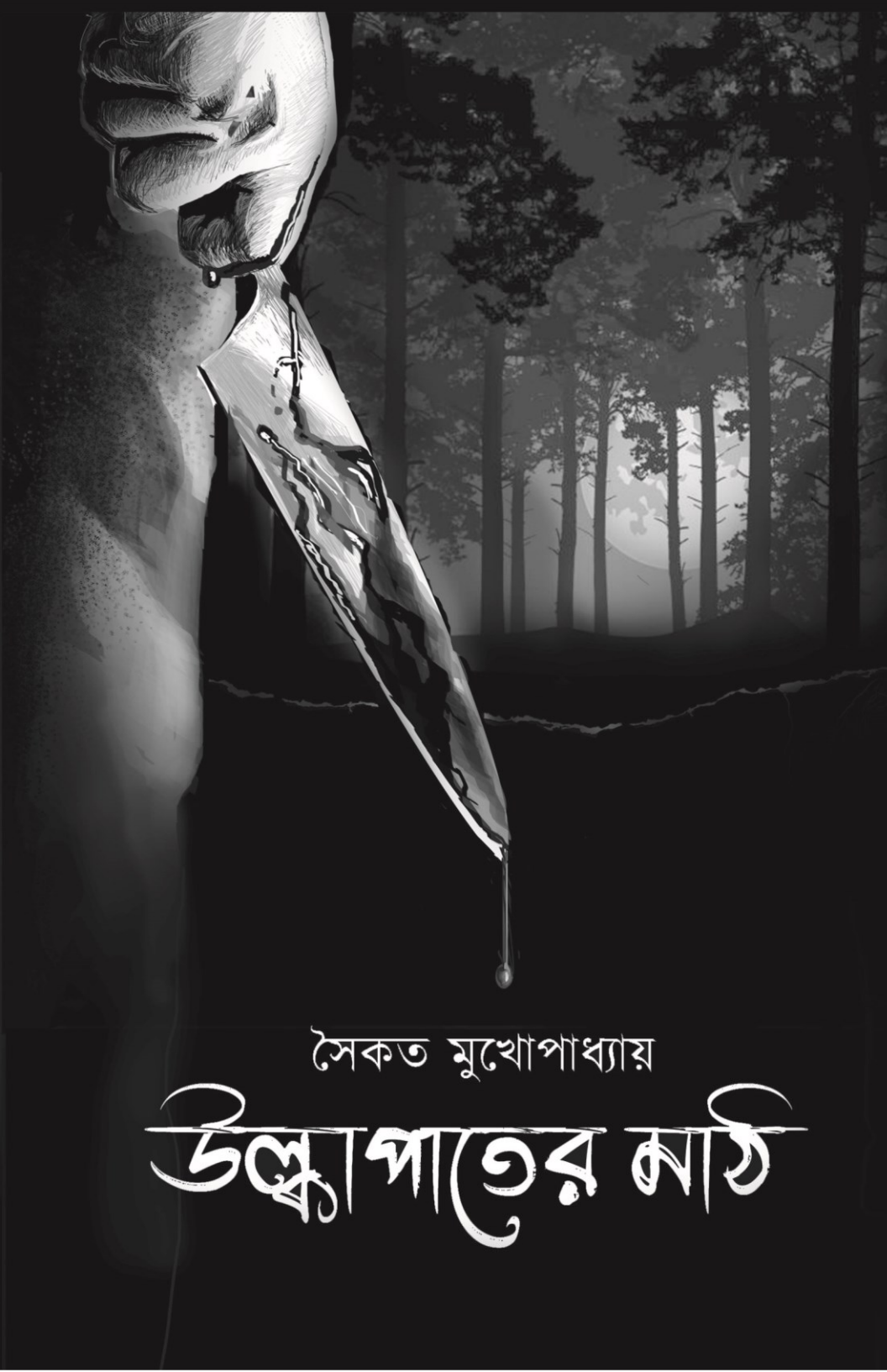

সৈকত মুখোপাধ্যায়

উল্কাপাতের মাঠি

বাইশে এপ্রিল বিকেলে অরিত্র আত্মহত্যা করবার জন্যে যোশিমঠ-আউলি রোডের ধারে এক জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছিল। তার আগে আত্মহত্যার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল সে।

ঘুমের ওষুধের পাতাগুলো তাকে নতুন করে জোগাড় করতে হয়নি; ওগুলো গত একবছর ধরেই অরিত্রর সঙ্গে অজ্ঞাতবাসের পথে-পথে ঘুরছিল; কলকাতার বারোটা আলাদা-আলাদা ওষুধের দোকান থেকে কেনা বারোটা সিডেটিভ ট্যাবলেটের পাতা।

আসলে প্রথমে অরিত্রর প্ল্যান ছিল, জয়িতাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েই মারবে। তারপরে নেটফেট ঘেঁটে দেখেছিল, মারার জন্যে যতগুলো ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে, ততগুলো ট্যাবলেট ওকে না জানিয়ে খাওয়ানো অসম্ভব। তখন ও প্ল্যান চেঞ্জ করে। মাত্র দুটো ট্যাবলেট কফির মধ্যে মিশিয়ে জয়িতাকে খাইয়েছিল, যাতে গলায় ছুরি বসানোর সময় রেজিস্ট করতে না পারে। বাকি ওষুধগুলো কলকাতা থেকে পালাবার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

তখন প্রমাণ লোপ করার চিন্তা থেকেই ওষুধের স্ট্রিপগুলোকে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়েছিল অরিত্র। কিন্তু ক্রমশ যখন ওর হাতের টাকা ফুরিয়ে এল, বুঝতে পারল যে চিরকাল লুকিয়ে থাকার পক্ষে মানুষের আয়ু ভীষণই লম্বা এবং সর্বোপরি যখন ও খবর পেল যে পুলিশ ওকে ঘিরে এবার জাল গুটিয়ে আনছে, তখন ওর মাথায় এল, তাহলে ঘুমের ওষুধগুলোকে ফেলে না দিয়ে একসঙ্গে সবকটা খেয়ে নেওয়া যেতে পারে তো।

তবে এ ছাড়াও আত্মহত্যা করার আগে আরও অনেক কাজ থাকে মানুষের। বাইশে এপ্রিল সকাল থেকে অরিত্র সেই কাজগুলো সেরে ফেলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

যোশিমঠের সবচেয়ে গরিব বস্তিটার মধ্যে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সে গত দু-মাস বাস করছিল। যার ঘর তাকে পুরোমাসের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলল, এখানকার কাজ মিটে গেছে; তাই সে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে।

যে জামাকাপড়গুলো পরে বিকেলে বেরোবে বলে ঠিক করেছিল, সেগুলো বাদে বাকি সমস্ত জামাকাপড়, দু-চারটে বাসনপত্র যা ওর ছিল আর বালিশ-কম্বল— খুব ভোর-ভোর বেরিয়ে সব রেখে দিয়ে এল একটা মন্দিরের গেটে। পরে, বেলার দিকে একবার সেখানে গিয়ে দেখে এসেছিল, ভিখিরিদের হাতে-হাতে জিনিসগুলো চমৎকারভাবে লোপাট হয়ে গেছে।

নিজের বলতে বাকি ছিল ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী কালো কাঁধব্যাগটা, যেটা

থেকে পুলিশ ওর মৃতদেহ সনাক্ত করতে পারে। তাই দুপুরে হোটেলে খেয়ে এসে, ব্যাগটা খুলে, ভেতরের কাগজগুলো নিয়ে বসল অরিত্র।

প্রথমেই বেরিয়ে এল সেই প্রেসক্রিপসনটা, যেটা দেখিয়ে ও ঘুমের ওষুধ কিনেছিল। ওদের কোন্নগর নবপল্লির বুড়ো ডাক্তার শম্ভু দেবনাথের প্রেসক্রিপসন। এল.এম.এফ ডাক্তার। তার ওপরে আশি পার করার পর ডাক্তারবাবুর নিজেরই একটু ভিমরতি মতন হয়ে গিয়েছিল। সেই সুযোগটাই নিয়েছিল অরিত্র। মিথ্যে করে নিজের ইনসম্নিয়ার কথা বলে, ঘুমের ওষুধটা প্রেসক্রাইব করিয়ে নিয়েছিল।

তা ছাড়া কলকাতা থেকে পালিয়ে আসার সময় ওই ছোটো কাঁধব্যাগটা ভরতি করে ক্যাশ-টাকা নিয়ে এসেছিল সে। যেভাবে ঘুমের ওষুধ জমিয়েছিল, ঠিক সেইভাবেই জয়িতাকে খুন করার আগে অল্প অল্প করে প্রতিদিন এ.টি.এম থেকে টাকা তুলে ব্যাগে রাখত। কলকাতা থেকে পালাবার সময় সেই এ.টি.এম কার্ড আর সেলফোন হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে গঙ্গায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে এসেছিল। সেইজন্যেই পুলিশ এখনও তাকে ট্রেস করতে পারেনি।

তবে টাকা ফুরিয়ে এসেছে। আর মাত্র কয়েকটা পাঁচশো-টাকার নোট ব্যাগের এক কোনায় পড়েছিল। এগুলোর কোনো প্রয়োজন রয়েছে? একমিনিট ভুরু কুঁচকে ভাবল সে। তারপর আপনমনেই বলল, "নাঃ।"

বেঁচে থাকতে গেলে কাজে লাগত এমন আরও কিছু কাগজপত্র ছিল ব্যাগটার মধ্যে। আর ছিল একটা প্লাস্টিকের খেলনা। চাবি ঘুরিয়ে দম দেওয়া একটা দোলনা। অনেকটা হ্যামকের মতন দেখতে। হ্যামকে একটা খোকা শুয়ে ঘুমোচ্ছে। দম দিয়ে ছেড়ে দিলে দোলনাটা সামনে পেছনে দুলতে থাকে আর টুংটাং করে মিষ্টি একটা বাজনা বাজে। এটা অরিত্ররই ছোটোবেলার খেলনা। ওর প্রাণ।

টাকা আর কাগজপত্রগুলো জ্যাকেটের দু-পকেটে ঠেসে ঢুকিয়ে নিল সে। খেলনাটাকে চালান করে দিল জ্যাকেটের নীচে, পেটের কাছে। তারপর খালি ব্যাগটাকে নালার ধারে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ঘরের দরজায় তালা লাগাল না। শুধু যাবার সময় বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে গেল।

অরিত্র চেয়েছিল তার মৃতদেহটা লোকচক্ষুর আড়ালে একটা বিশাল পাইনগাছের গুঁড়ির আড়ালে পড়ে থাকুক। তখন বসন্তকাল। সে স্বপ্ন দেখত, সামনের বর্ষায় তার শরীরের অবশেষ থেকে অনেক শিশু-বৃক্ষ জন্ম নিচ্ছে। পাঁজরের ফাঁক দিয়ে লতিয়ে উঠছে আইভি লতা। করোটি ফাটিয়ে মাথা চাড়া দিচ্ছে হেমলক আর বেলেডোনা গাছ আর তার গলিত মাংসের রস শুষে নিয়ে পাহাড়ি ধুতরোর চারাগুলো লকলক করে বেড়ে উঠছে।

হ্যাঁ, শুধু বিষাক্ত গাছপালার কথাই মাথায় আসত অরিত্রর। কারণ, তার কেমন যেন ধারণা হয়েছিল— যে-মানুষ বিষ খেয়ে মরে, অবিষাক্ত উদ্ভিদেরা তার শরীরের সার সহ্য করতে পারবে না।

তাতে অখুশি ছিল না অরিত্র। সে ভাবত, বিষাক্ত গাছেরাও তো গাছ। যতক্ষণ না তুমি তার পাতায়, ফুলে কিংবা ফলে হাত দিচ্ছ, ততক্ষণ সেও টগর, জুঁই কিংবা হাসনুহানার মতোই সুন্দর। যেমন বিষাক্ত মানুষেরাও সুন্দর মানুষ, যতক্ষণ না অন্য কেউ বলে দিচ্ছে যে, ওই দ্যাখো, ওই মানুষটা কিন্তু ভয়ানক বিষাক্ত।

আসলে এইসব কথা ভাবার সময় অরিত্রর মাথার মধ্যে ওর মা আর জয়িতার ছবিগুলোই ঘুরত। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই জয়িতা অরিত্রর মাকে কথায়-কথায় বলত, "আপনি একজন বিষাক্ত মানুষ।" শেষদিকে আর 'আপনিটাপনি' নয়; সরাসরি তুইতোকারি করেই শ্বাশুড়িকে বলত, "তুই একটা ডাইনি। নাহলে বিধবা হয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে পর্নো-সাইট দেখিস। আমি সব জানি।"

অরিত্রর কিন্তু নিজের মা-কে কখনও বিষাক্ত মনে হয়নি।

অরিত্রর বিয়ের ঠিক তিনবছর বাদে, সেটা ছিল বছর শেষের রাত, একটা পার্টি থেকে বাবা আর মা বাড়ি ফিরছিল। বাবাই ড্রাইভ করছিলেন, মা ছিল পাশে। সেদিন মাঝরাতের পর ঘন কুয়াশা নেমেছিল কলকাতার বুকে। সায়েন্স সিটির কাছে বাবার হালকা সিডান-কার সপাটে ধাক্কা মেরেছিল ফ্লাইওভারের একটা পিলারের পেটে। বাবা সঙ্গে-সঙ্গেই মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, বাবার পাশের সিটে বসে থাকা মায়ের এক্সটার্নাল ইনজুরি বলতে ছিল শুধু ভুরুর ওপরে একটা ছোট্ট ক্ষত। আসল ক্ষতিটা হয়েছিল ভিতরে— পায়ের নার্ভগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল।

তবে অদম্য প্রাণশক্তি ছিল বটে মায়ের। অরিত্র চোখ বুজলেই এখনও দেখতে পায়, ভীষণ ফরসা আর একটু থলথলে চেহারার নিয়ে ওর মা তারপরেও কথায়-কথায় হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠছে। দু-হাত দিয়ে হুইল-চেয়ারের চাকা ঘুরিয়ে ড্রেসিং-টেবিলের সামনে গিয়ে বসছে। ওখানে বসেই একমনে চুলে কলপের ব্রাশ বোলাচ্ছে। কিংবা চেয়ারের পিছনদিকে মাথা হেলিয়ে চিকেনের লেগপিস থেকে ছিঁড়ে নিচ্ছে মাংসের ফাইবার, ঝোল গড়িয়ে পড়ছে কনুই বেয়ে।

জয়িতা তো ভুল বলতে পারে না। এত পজিটিভ-এনার্জি সত্ত্বেও মা নিশ্চয় ডাইনিই ছিল। সেই মাও কিন্তু অপঘাতেই মারা গেল। হুইল-চেয়ারটা যে কেমন করে দোতলার সিঁড়ির মাথা থেকে নীচে গড়িয়ে পড়েছিল সেটা এক রহস্য। অরিত্র তখন অফিসে ছিল। বাড়িতে ছিল কেবল জয়িতা।

জয়িতার বুদ্ধিকে আজও শ্রদ্ধা করে অরিত্র। এমনকি এও মনে হয় যে, জয়িতার গলার নলি কেটে দেবার আগে তার কফির মধ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়ার মতন বুদ্ধি তার নিজের মাথায় কখনোই আসত না, যদি না সে জয়িতার সঙ্গে চার বছর একই ছাদের নীচে বাস করত। জয়িতার খর চোখের নজর থেকে ক্রমাগত নিজের আর মায়ের নানান ক্রিয়াকলাপ লুকোতে-লুকোতেই তার মধ্যে একটা চতুরালি জন্ম নিয়েছিল।

অরিত্র জানে, জয়িতা নিজেই ছিল বিষাক্ত। কিন্তু ওরও সৌন্দর্য নিয়ে কোনো কথা হবে না।

বিষাক্ত অথচ সুন্দর ওই দুই নারীর সঙ্গে অরিত্রর জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল বলেই হয়তো সে মৃত্যুর পরে আবার বিষফুল বিষলতা হয়ে জন্মাতে চাইত।

সে যা-ই হোক, যেটা আমাদের চমকিত করে সেটা হল, পিছনের সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে, কাঁধব্যাগে বারো-পাতা অ্যালজোলাম নিয়ে বেরিয়ে আসার পরেও সেই বাইশে এপ্রিল বিকেলে অরিত্রর সুইসাইড করা হয়নি। যদিও আর কিছুদিনের মধ্যেই সে মারা গিয়েছিল। তবে তার কারণ অন্য।

* * *

যোশিমঠ থেকে যে-রাস্তাটা আউলির দিকে চলে গেছে, সেই চকচকে পিচরাস্তার ধারে একটা মনোমতন জায়গা বেছে রেখে গিয়েছিল অরিত্র— যেভাবে নাকি মধ্যযুগে নবাব-বাদশাহরা নিজেদের কবরের জায়গা পছন্দ করে রাখতেন।

সময়টা, শুরুতেই বলেছি, এপ্রিল মাসের শেষদিক। ফলে আউলির দিকে স্কি করতে যাবার ভিড় তখন আর ততটা ছিল না, কারণ, সে-বছর বেশ তাড়াতাড়ি আউলির স্কি-গ্রাউন্ডের বরফ গলে গিয়েছিল। যোশিমঠ-আউলি রোড তখন সারাদিন শুনশান পড়ে থাকত।

দু-পাশের ঘন পাইনবনে অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁর ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ ওঠে না কোথাও। সেই নৈঃশব্দকে ছিঁড়ে মাঝেমধ্যে তীব্র স্বরে ডেকে ওঠে একটা পাখি। অনেকটা সময়ের ব্যবধানে একটা করে গাড়ি রাস্তার এক বাঁক থেকে বেরিয়ে অন্য বাঁকের আড়ালে হারিয়ে যায়। বাকি সময়টায় রাস্তার ওপরেই তিতির কিংবা বনমোরগ চরে বেড়ায়।

সেখানেই একটা বিশাল পাইনগাছের গোড়ায় পাথরের ওপরে বসেছিল অরিত্র। জলের বোতল আর ওষুধের স্ট্রিপগুলোকে একপাশে সরিয়ে রেখে, ব্যাগ থেকে কাগজপত্রগুলো বার করে একটা ছোটো গর্তের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলছিল। ও হ্যাঁ। সেই খেলনা দোলনাটাকেও সে জলের বোতলের পাশে রেখে

দিয়েছিল। ছোটোবেলা থেকেই ওই দোলনাটাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে না শুলে সে ঘুমোতে পারে না। আজকেও অরিত্র ঠিক করেছিল তা-ই করবে। টুংটাং আওয়াজ শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়বে শেষবারের মতন।

তবে তার আগে কাগজগুলোকে মাটিতে পুঁতে ফেলা দরকার। সেইজন্যেই অরিত্র গর্তটার মধ্যে কাগজগুলোকে ফেলে দিচ্ছিল। ফেলতে গিয়ে দেখল, ওগুলোর মধ্যে একবছর আগের একটা বাংলা নিউজপেপারের পাতাও রয়েছে। বিয়ের কনের সাজে জয়িতার মুখের একটা ছবির সঙ্গে ওর খুনের খবরটা ওখানেই বেরিয়েছিল। খবরের শেষে লেখা আছে, মৃতার স্বামী ফেরার।

খবরের কাগজের পাতাটার সঙ্গে বাকি কাগজগুলোও গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে, পা দিয়ে ঝুরো মাটি টেনে-টেনে গর্তটাকে বোজাতে শুরু করেছিল অরিত্র। এর পরেই সে ঘুমের ওষুধগুলো খেয়ে নিত। কিন্তু ঠিক তখনই তার পেছনে দাঁড়িয়ে কেউ হিন্দিতে প্রশ্ন করল, "লুকোতে চাও? আমার একটা ভালো জায়গা জানা আছে।"

অরিত্র চমকাল না। মানুষ ভয় পেলে চমকায়। কিন্তু যে-মানুষ আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তার আর ভয় থাকে না। অরিত্র পেছনের দিকে না তাকিয়েই বুটের হিল দিয়ে ঝুরোমাটির ওপরে দুরমুশ করতে-করতে উত্তর দিল, "না। আর লুকোতে চাই না। একবছর লুকিয়ে থেকে-থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পরেশান হো গ্যয়া হুঁ ম্যায়। এবার মরতেই চাই।"

লোকটা ঘুরে ওর সামনে চলে এল। শান্তগলায় বলল, "ওই একই হল। আত্মহত্যা আর আত্মগোপনের মধ্যে খুব একটা তফাত নেই।"

এবার অরিত্র মুখ তুলে লোকটাকে দেখল।

উন্মাদ নয়, সন্ন্যাসীও নয়। মাঝবয়সি লোকটাকে দেখে প্রথমেই মনে আসে কোনো অভিযাত্রীর কথা— এক্সপ্লোরার।

রোদে-পোড়া চামড়া। গাঁটওলা বাঁশের মতন শক্তপোক্ত চেহারা। ঘাড় অবধি কাঁচাপাকা চুল... দেখলেই বোঝা যায় চিরুনি চলে না। সেরকমই নুন-মরিচ দাড়ি গোঁফ। সন্দেহ নেই, এ লোক জীবনের বেশি সময়টা খোলা আকাশের নীচে কাটিয়েছে। লোকটার পরনে ছিল খাকি ডেনিম জাতীয় কোনো কাপড়ের ট্রাউজার আর চামড়ার জ্যাকেট। পিঠে একটা ক্যানভাসের স্লিং-ব্যাগ।

লোকটা নিঃসন্দেহে শিক্ষিত। একপলক তাকিয়েই ওষুধগুলোর চরিত্র বুঝে নিয়েছে। অরিত্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পায়ের বুট থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলতে শুরু করল। কী আর করবে? অন্য কারুর চোখের সামনে আত্মহত্যা করতে তার একেবারেই ইচ্ছে করছিল না। আর সে চাইলেও লোকটা বোধহয় সেটা করতে দিত না।

আগন্তুক এবার অরিত্রর মুখোমুখি অন্য একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপরে

আরাম করে বসল। তারপর খুব ক্যাজুয়ালি— যেন ক্লাসে লেকচার দিচ্ছে এইভাবে বলল, "দোলনা এক আশ্চর্য জিনিস, বুঝলেন। আমরা সবাই দোল খেতে ভালোবাসি। দুলুনি জিনিসটা আমাদের একটা নিশ্চিন্ততা এনে দেয়... আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। ট্রেনের বাংকের দুলুনি, নৌকার পাটাতনের দুলুনি, হ্যামকের দুলুনি কিংবা বাচ্চাদের দোলনা— সে যা-ই হোক। কেন এরকম হয় জানেন?"

অরিত্র অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

প্রশ্নটা করেই অরিত্র বুঝতে পারল, তার মৃত্যুচিন্তায় অনেকদিন বাদে এই প্রথম একটা ছেদ পড়ল; অন্য কিছুতে আগ্রহ দেখিয়ে বসল সে। অবশ্য অরিত্র আর কিছু ভাববার সুযোগ পেল না। কারণ লোকটা ততক্ষণে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করে দিয়েছে—

"বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, এর সঙ্গে আমাদের মাতৃগর্ভের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। মাতৃগর্ভ মানে জরায়ু— বাইরের কোনো আঘাত যেখানে পৌঁছোয় না।

"একবার ভাবুন জরায়ুর ভেতরে ভ্রূণের কথা। না না, আমি জানি, আপনি প্রায়ই ভাবেন। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার পুরো জীবনটাই ওই ভাবনা দিয়ে গড়া। তবু আরেকবার মনে করুন অ্যামনিওটিক-ফ্লুইডের সেই স্নিগ্ধ ছোঁওয়া— না গরম, না ঠান্ডা এক জলের বিছানা। সেই প্রায়-নৈঃশব্দ। সেই অন্ধকার।

"দীর্ঘ ন'মাসের সেই নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে বাইরে এসে আমরা বড্ড ভয় পেয়ে যাই। পাবই তো। এত আওয়াজ বাইরের পৃথিবীতে। এত আলো। এত গরম কিংবা শীত। সেইজন্যেই আমরা আবার মাতৃগর্ভের নিশ্চিন্ততা খুঁজি। আর ঠিক তখনই ওই দুলুনি আমাদের সেই প্রার্থিত নিশ্চিন্ততা এনে দেয়। কেন বলুন তো?"

"কেন?" আবার প্রশ্ন করে বসে অরিত্র।

"কারণ গর্ভবাসের দিনগুলোতে আমরা একটা মাত্র শব্দের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। দিন নেই, রাত নেই, মাসের পর মাস একটাই শব্দ— লাব ডুব, লাব ডুব, লাব ডুব। মায়ের হৃৎপিণ্ডের সিস্টোল ডায়াস্টোলের শব্দ। হ্যাঁ, জরায়ুর মধ্যে ওই একটিমাত্র শব্দই আমাদের কানে পৌঁছোয়। ঘুমপাড়ানি গান আর দোলনার দোল আসলে ওই হৃদয়ের ছন্দের নকল।"

"এসব কথা হঠাৎ আমাকে শোনাতে বসলেন কেন? কেটে পড়লেই পারেন তো এবার।" কঠিনমুখে বলল অরিত্র।

"ওই খেলনাটার জন্যে—" আঙুল দিয়ে প্লাস্টিকের দোলনাটার দিকে দেখাল লোকটা। বলল, "খেলনা দিয়ে আর কতদিন নিজেকে ভোলাবেন? সত্যিকারে মাতৃগর্ভে ফিরতে চান না?"

অরিত্রর চোখদুটো চকচক করে উঠল। সে একটুও দেরি না করে উত্তর দিল, "চাই। মা বেঁচে থাকতেও চাইতাম। মা মরে যাওয়ার পরেও চেয়েছি। কিন্তু জয়িতার জন্যে পারিনি।"

"জয়িতা কে? আপনার স্ত্রী? বেঁচে নেই বোধহয়, তা-ই না?"

অরিত্র সেই প্রশ্নের উত্তরে মাথা নাড়ে।

"জয়িতা কেমন করে মারা গেছে সেটা আন্দাজ করতে পারছি। আপনার মা নিশ্চয় তার কিছুদিন আগেই মারা গিয়েছিলেন। আপনি কি আপনার মায়ের মৃতদেহ সারাজীবন ঘরের মধ্যে রেখে দিতে চেয়েছিলেন? জয়িতা রাখতে দেয়নি?"

অরিত্র অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এত সব জানল কেমন করে লোকটা!

লোকটা ওকে অবাক হতে দেখে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল, তবে ও-ব্যাপারে আর কিছু বলল না। বরং আবার সেই আগের প্রসঙ্গেই ফিরে গিয়ে বলল, "শুনুন। আমরা সকলেই, সারা জীবন, মাতৃগর্ভের নিশ্চিন্ততায় ফিরে যেতে চাই। সঙ্গমের মধ্যেও আমাদের সেই ইচ্ছেই লুকিয়ে থাকে। কিন্তু ওভাবে ফেরা যায় না। যখন ফিরতে পারে না, তখনই আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ আত্মহত্যার কথা ভাবে।"

অরিত্র ঠিক বুঝতে পারছিল না, এবার তার অপমানিত বোধ করা উচিত কি না। এটা তো পরিষ্কার যে, লোকটা তাকে উদ্দেশ্য করেই ওই সুইসাইডফুইসাইডের কথাগুলো বলছে। কিন্তু সে ঠিক করল আপাতত যেটা বেশি জরুরি, সেটা নিয়েই কথা বলা যাক। সে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, "ওভাবে হয় না বলছেন। অন্য কোনো রাস্তার কথা জানা আছে নাকি—মাতৃগর্ভে ফেরার?"

"আছে বই-কি।" লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। বলল, "আমি আপনাকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিতে পারি... আই মিন, সেই মহাজাগতিক মাতৃগর্ভে।"

অরিত্র হাঁ করে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা বলল, "বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠিক আছে, চলুন আমার সঙ্গে। ভয়ের সেরা ভয় হচ্ছে মৃত্যুভয়; আপনার তো সেটাই নেই। তাহলে চিন্তা করছেন কেন?"

অরিত্রও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চিন্তা নয়, আসলে ভাবছিলাম সেটা কীভাবে সম্ভব। যা-ই হোক, আপনি বলছেন যখন, চলুন।"

রওনা দেওয়ার আগে অরিত্র একটু ইতস্তত করে পাঁচশোর নোটগুলো কুড়িয়ে পকেটে ভরতে যাচ্ছিল। হয়তো ভাবছিল, মরাই যখন হল না তখন আর ওগুলোকে...। লোকটা বলল, "উঁহু উঁহু। কিচ্ছু নেবেন না। সবকিছু মাটির নীচে চাপা দিয়ে দিন। জলের বোতল, ঘুমের ওষুধ আর হ্যাঁ... দোলনাটাও।

ওগুলো আর আপনার কোনো কাজে লাগবে না। আপনি যখন মায়ের পেটে ছিলেন তখন ওসব জিনিস ছিল আপনার কাছে?”

অরিত্র লজ্জিতমুখে ঘাড় নাড়ল।

লোকটা বলল, “আমারও টাকার প্রয়োজন নেই। আমি একজন ‘হান্টার-গ্যাদারার’। শিকার করি, বনের ফলমূল কুড়িয়ে খাই। এই যে পোশাক দেখছেন, এগুলো নিজেই জন্তুর চামড়া সেলাই করে বানিয়ে নিয়েছি। যা-ই হোক, চলুন এবার! অনেকটা পথ যেতে হবে।”

অরিত্র লোকটার সঙ্গে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে পড়ল। তখন সন্ধে হচ্ছিল। চারিদিকে ময়র ডাকছিল খুব।

* * *

লোকটাকে অনুসরণ করে সেদিন প্রায় সারারাত হেঁটেছিল অরিত্র। ঘণ্টাখানেক হাঁটার পরেই জঙ্গলের আওতা থেকে বেরিয়ে এসেছিল ওরা।

বৈশাখমাসের ত্রয়োদশীর রাত ছিল সেটা। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছিল চরাচর। প্রান্তরের প্রতিটি পাথরের, প্রতিটি ঘাসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের একটা করে কালো রঙের রেপ্লিকা— যাকে বলে ছায়া। অরিত্রর মনে হচ্ছিল যেন ওদের চেনা বস্তুজগতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অচেনা এক অন্ধকার জগৎ। অ্যান্টি-ইউনিভার্স।

রাতের তৃতীয় প্রহরে চাঁদ অস্ত যাবার পরে ছায়াগুলো মিলিয়ে গেল। কিন্তু তখন শুরু হল এক অন্যরকমের কালাজাদু। কোটি-কোটি তারা চতুর্দিক থেকে প্রান্তরটাকে ঘিরে ধরল। শুধু মাথার ওপরে নয়, পায়ের নীচেও তারা দেখা যাচ্ছিল। এতটাই ভয়ানক সেই অভিজ্ঞতা যে, একটা সময়ের পর অরিত্র আর না পেরে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার ভয় হচ্ছিল, এরপর তারার আগুনে তার পা পুড়ে যাবে।

আগন্তুক লোকটা শিরদাঁড়া সোজা রেখে ওর সামনে-সামনে হেঁটে চলেছিল।

কথাবার্তা বলছিল না বিশেষ। কিন্তু অরিত্র থেমে যেতেই সে কীভাবে যেন বুঝতে পারল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "কী হল?"

অরিত্র ভয়ে-ভয়ে সামনের দিকে আঙুল তুলে দেখাল— এত তারা!

"শিট-আইস, এখনও গলেনি। বরফের ওপরে তারার আলো রিফ্লেক্ট করছে। ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে চলে আসুন।"

ভোরের আলো ফুটতে যখন আর একটু দেরি, তখন ওরা ছোটো একটা বুগিয়ালের প্রান্তে পৌঁছোল। চতুর্দিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা সেই তৃণভূমির ঠিক মাঝখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে স্টান্টেড-রডোডেনড্রনের ঘন বন। দিনের পর দিন অবিরাম ব্লিজার্ডের ঝাপটায় গাছগুলো বেঁটে বামন হয়ে গেছে। সেই বনের ধারেই ছিল একটা ঘর। ঘরটার কাঠের দেয়াল, শ্লেটপাথরের ছাদ। ঘরের দরজার শেকল খুলে লোকটা অরিত্রকে ডাকল, "আসুন, ভিতরে আসুন।"

দরজাটা নিচু। অরিত্র মাথা হেঁট করে ঘরের ভিতরে ঢুকল। ঘরের এককোনায় পাথরটাথর দিয়ে একটা ফায়ারপ্লেসের মতন জিনিস বানানো হয়েছিল। সেখানে তখনও ধিকধিক করে জ্বলছিল অঙ্গারের স্তূপ। বন্ধ ঘরের মধ্যে আলো বলতে ওইটুকুই। সেই আলোতে অরিত্র দেখল মেঝের একপাশে শুকনো মুথাঘাসের গদির ওপরে পশুর চামড়া বিছানো রয়েছে। বোঝা যায়, এ ঘরে বসা-শোয়া সব ওখানেই। অন্য আরেক কোণে পাথরের উনুন আর কিছু বাসনপত্র। দেয়ালে আড়াআড়িভাবে টাঙানো রয়েছে দুটো বন্দুক। মোটামুটিভাবে ঘরটার মধ্যে দেখার জিনিস বলতে এইটুকুই।

লোকটা অরিত্রকে বলল, "আরাম করে বসুন।"

অরিত্র রুক্ষভাবে বলতে চেয়েছিল, "বসতে আসিনি। যে কথা দিয়েছিলেন সেটা রাখুন।" কিন্তু বলতে পারল না। ও বুঝতে পারছিল, লোকটার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই ওর ভিতরে একটা ভাঙচুর শুরু হয়েছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, এই পৃথিবী তার চেনা পৃথিবী নয়। এই জীবনটাও যেন ঠিক তার আগের জীবনের অংশ নয়। অন্য কোথাও, অন্য এক অরিত্রের জীবন যাপন করতে শুরু করেছে সে। তার কনফিডেন্স টলে গিয়েছিল।

অতএব অরিত্র কিছু না বলে, পা ভাঁজ করে পশুর চামড়ার আসনের ওপরে বসল।

লোকটা ইতোমধ্যে অঙ্গারের স্তূপ থেকে আগুন নিয়ে উনুন ধরিয়ে ফেলেছিল। এবার উনুনের আগুনে একটা বড়ো সসপ্যান চাপিয়ে জল ফুটতে দিল।

অরিত্র অন্যমনস্কভাবে ঘাসের ওপরে বিছিয়ে রাখা চামড়াটার ওপরে হাত বোলাচ্ছিল। তার মনে পড়ছিল নাইটির ছোটো হাতার বাইরে বেরিয়ে থাকা তার মায়ের মাখনের মতন বাহুদুটোর কথা। এইরকমই গোলাপি রঙের ত্বক ছিল

মায়ের হাতে। এইরকমই খুব সূক্ষ্ম সোনালি রোম... মসৃণ। চামড়াটার ওপরে হাত বোলাতে ভালো লাগছিল তার। ভাবছিল, এটা কীসের চামড়া?

হঠাৎই তার খেয়াল হল, লোকটা উনুনের সামনে থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। অরিত্র তা-ই দেখে তাড়াতাড়ি হাতদুটো গুটিয়ে নিল।

দুটো মগে গরম কোনো পানীয় নিয়ে লোকটা অরিত্রর পাশে এসে বসল। সঙ্গে একটা প্লেটে সেঁকা বাদামজাতীয় কিছু ফল। খিদে আর তেষ্টা দুটোই পেয়েছিল অরিত্রের। সে একমুঠো বাদাম মুখের মধ্যে পুরে চিবিয়ে গিলে ফেলল। অচেনা স্বাদ, তবে খেতে খারাপ নয়। তারপরে পানীয়ের মগে চুমুক দিল। চা নয়, কফিও নয়; কিন্তু এটার স্বাদও অপূর্ব।

লোকটা ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন বলল, "লোকালয়ে যাই না, বুঝলেন। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালো লাগে না। আর তার প্রয়োজনই বা কী? যা কিছু প্রয়োজন এই পাশের বনজঙ্গল থেকেই পেয়ে যাই। এই চা-পাতার মতন গাছের পাতা, এই বাদাম, সবই এক জলাভূমির তীরে খুঁজে পেয়েছি।"

কথা চালাবার জন্যেই অরিত্র জিজ্ঞেস করল, "কাল যখন আমার সঙ্গে দেখা হল, তখন কোথায় গিয়েছিলেন তাহলে?"

লোকটা ক্যানভাসের স্লিং-ব্যাগের মুখের দড়ির ফাঁসটা খুলে ঝাড়া দিতেই ভিতর থেকে একটা মরা তিতিরপাখি ধপ করে মেঝের ওপরে পড়ল। লোকটা বলল, "যে-রাস্তাটার ধারে আপনাকে দেখতে পেলাম, ওখানে ন-মাসে ছ-মাসে আপনার মতন কোনো পুরুষমানুষ এসে বসে... ঠিক ওই পাইনগাছের নীচটাতেই। তাদেরও সঙ্গে থাকে বিষ কিংবা ঘুমের ওষুধ। নাহলে নতুন ব্লেড। খেলনাটা সবার সঙ্গে থাকে না অবশ্য। তবে ছবির বই থাকে। কিংবা ঘুমপাড়ানি গানের ক্যাসেট-প্লেয়ার। আমি তাদের এখানে নিয়ে আসি।"

অরিত্র বুঝতে পারছিল, লোকটার কথা শুনতে-শুনতে তার কেমন যেন ঘোর লেগে যাচ্ছে। নাহলে এইমাত্র ও যে-কথাটা বলল, তাতে তার অবাক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কই, হচ্ছে না তো। তবু সে কোনোরকমে প্রশ্ন করল, "কেন? নিয়ে আসেন কেন?"

"আনব না?", প্রতিপ্রশ্ন করল লোকটা, "আপনি যেমন গর্ভ খুঁজছেন, তেমনই গর্ভও তো বীজ খোঁজে। বিশেষত মাসিকের পরের ওই উর্বর সময়টায়। আর দু-দিন এখানে থাকুন। সেই 'হিট' আপনিও ফিল করতে পারবেন।"

অরিত্র কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না। বোকার মতন হাসল। লোকটা কেমন যেন করুণ গলায় যোগ করল— "ও আমাকে সেই বীজ খুঁজতে পাঠায়। তাই যেতে হয়।"

কার গর্ভ, কার হট, কার জন্যে বীজ আর কেই বা লোকটাকে খুঁজতে

পাঠায়, কিছুই জানা হল না অরিত্রর। মানে সে নিজেই জানতে চাইছিল না। মাথার ভেতরটা ক্রমশ শূন্য হয়ে আসছিল। দুপুরবেলায় তিতিরের মাংস দিয়ে রুটি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙল, দেখল লোকটা ঘরে নেই।

অরিত্র একাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আকাশে তখনও বিকেলের আলো ছিল। অরিত্র আশপাশে পায়চারি করতে করতে হঠাৎই দেখল, ঘরটার পেছনে একটা বিরাট মেশিন পড়ে আছে। এই তৃণভূমির মধ্যে খুবই বেমানান সেটা। এমন মেশিন এখানে কোথা থেকে এল? কেনই বা এল?

মেশিনটা বিরাট, কিন্তু জটিল নয়। অথচ দেখলেই বোঝা যায় অসম্ভব কঠিন কোনো কাজ করার জন্যে ওটার জন্ম হয়েছিল। অনেকটা হাতির শুঁড়ের মতন সহজ এবং শক্তিশালী; এখন মাটির মধ্যে অর্ধেকটা ঢুকে গেছে। কতবছর ধরে এখানে পড়ে আছে কে জানে। কী ধাতু দিয়ে ওটা তৈরি, তাও বুঝতে পারল না অরিত্র। কোনো মেটালের গায়ে কি এমন কমলা আভা থাকে? কোথাও মরচেও পড়েনি এতটুকু।

পশ্চিমের একটা তুষারশৃঙ্গের পেছন থেকে হঠাৎই সার্চলাইটের মতন রুপোলি একটা আলোর বিম এসে বুগিয়ালটাকে আলোয় ভাসিয়ে দিল। অরিত্র দেখল, যেন পৃথিবীর থেকেও বড়ো একটা চাঁদ আস্তে-আস্তে পাহাড়ের পেছন থেকে বেরিয়ে আসছে। ঠিক তখনই লোকটা ওর পেছন থেকে বলে উঠল, "কাল পূর্ণিমা। কাল সকালে এক জায়গায় নিয়ে যাব আপনাকে।"

"আর গর্ভ? জরায়ুর জলের বিছানায় ফেরা?" অরিত্র জিজ্ঞেস করল।

"পূর্ণিমা মানে তো তাঁর পিরিয়ডের শেষদিন। কাজেই ধরুন পরশুই আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে।"

"কার পিরিয়ড? কে ইচ্ছে করলে?"

লোকটা একটু বিরক্তগলায় বলল, "কেন? আপনাকে মহাজাগতিক মাতৃকার কথা বলেছিলাম না?"

পরদিন খুব ভোরে ওরা দুজনে বেরিয়ে পড়ল। অরিত্র আর সেই লোকটা। স্টান্টেড রডোডেনড্রনের বনের মধ্যে দিয়ে লোকটাকে অনুসরণ করে হাঁটছিল অরিত্র। একটা জিনিস ও পরিষ্কার বুঝতে পারছিল— ওরা চলেছে একটা পায়ে চলা রাস্তা ধরে। এই নির্জন প্রান্তরের মধ্যে বন। সেই বনের মধ্যেও মানুষের পায়ে-পায়ে একটা সরু রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। এখানে কি অনেকদিন ধরে মানুষ আসছে? কেন আসছে? কী আছে এখানে? লোকটাকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল অরিত্র। তার মনে হল, খুব শিগগিরই সে সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। লোকটাই তাকে বলবে।

হাঁটতে-হাঁটতে কিছুক্ষণ পরে হঠাৎই একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে গেল ওরা। প্রায় একটা ফুটবল মাঠের আয়তনের সেই জমিটায় রডোডেনড্রনের গাছ তো দূরের কথা, একটা ঘাস অবধি ছিল না কোথাও। পায়ের তলায় ঝামাপাথরের মতন পোড়া মাটি আর সামনে একটা ছোটো টিলার মতন উঁচু পাথর। একটাই পাথরের ব্লক— যাকে ইংরিজিতে বলে 'মনোলিথ'।

পাথরটা অদ্ভুত। প্রথমত তার মসৃণতা দেখে মনে হচ্ছিল মাছি বসলেও পিছলে যাবে আর দ্বিতীয়ত... দ্বিতীয়ত জড়বস্তুর মধ্যে এমন নিখুঁত দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য দেখা যায় না। একটা গভীর খাঁজের দুপাশে একেবারে সম-আয়তনের দুটো চোখের জলের ফোঁটা যদি কল্পনা করা যায় তাহলে যেমন দেখাবে, পাথরটার শেপ ঠিক সেইরকম। দুটো 'টিয়ার-ড্রপ' পাশাপাশি মিশে একটা পানপাতার গড়ন ধরেছে। অবশ্য পানপাতার মধ্যে ত্রিমাত্রিকতা নেই, তাই তানপুরার খোল বললে আরও ভালো বোঝা যাবে। ওইরকমই সুন্দর ডৌল টিলাটার।

"ওটা কী? আর জায়গাটার এমন পুড়ে যাওয়া চেহারা কেন?" জিজ্ঞেস না করে পারল না অরিত্র।

লোকটা পাথরটার দিক থেকে চোখ না সরিয়েই উত্তর দিল, "যদি বলি ওই পাথরটার জন্যেই জায়গাটার এমন দুর্দশা, তাহলে কি বুঝতে পারবেন?"

"উল্কা?" অরিত্রর গলায় অবিশ্বাসের সুর।

"একদম ঠিক বলেছেন।" কথাটা বলে লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। অরিত্র অবাক হয়ে দেখল, তাঁর ইস্পাত-নীল চোখের তারায় যেন বিষাদের ছাপ। সে আবার বলল, "উল্কাটা যখন পড়েছিল তখন এত বেশি উত্তাপ ছিল যে, ওটা মাটি ছোঁয়ার অনেক আগেই এই পুরো তৃণভূমির সমস্ত গাছপালা আর ঘাস দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল। সমস্ত জন্তু পুড়ে মরে গিয়েছিল। কত বছর হল... কুড়ি-হাজার? তা-ই হবে।"

অরিত্র মুচকি হেসে বলল, "এমন করে বলছেন, মনে হচ্ছে আপনি যেন স্বচক্ষে উল্কাটাকে খসে পড়তে দেখেছিলেন।"

"দেখেছিলাম বই-কি।"

আর শুধু চোখে নয়; লোকটার গলার স্বরেও এবার বিষণ্ণতা ঘনিয়ে উঠল। সে বলে চলল, "সত্যি কথা বলতে কি, আমিও ওই উল্কাটার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমাকে ও মহাকাশ থেকেই ধরে এনেছিল। সেই থেকে আমি ওর ক্রীতদাস... স্লেভ।"

"কে? কার কথা বলছেন আপনি? কার স্লেভ?"

"ওই উল্কাপাথরটার কথা বলছি। কুড়িহাজার বছর ধরে ওই আমার মালকিন। আমার অন্নদাত্রী। মহাজাগতিক মাতৃকা।"

অরিত্র বুঝতে পারছিল, এই লোকটা ঠগ না হলেও উন্মাদ তো বটেই। এর ওপরে আর ভরসা করা যাবে না। তাকে আবার নতুন করে আত্মহত্যার উপায় ভাবতে হবে।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে পাথরটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল লোকটা। তারপর হঠাৎই বলল, "চলুন, এবার ফেরা যাক।"

"আমাকে কি এই পাথরটা দেখাবার জন্যেই নিয়ে এসেছিলেন?" প্রশ্ন করল অরিত্র।

লোকটা বলল, "হ্যাঁ। এরপর আপনাকে এখানে একাই আসতে হবে। তাই রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে গেলাম। চলুন।"

ফেরার পথে একজায়গায় অরিত্র দেখল, ফ্যাকাশে লাল জলের একটা সরু ধারা মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। সে বলল, "জলের রংটা কী অদ্ভুত না? মনে হয় মাটিতে হেমাটাইট আছে।"

লোকটা বিরক্ত গলায় বলল, "এখনও আপনি সবকিছু আপনাদের সামান্য বিজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করবেন? আপনাকে বলেছিলাম না, মহাজাগতিক মাতৃকার ঋতুচক্রের আজ শেষ দিন।"

* * *

সেই রাতে লোকটা মাংস রান্না করেছিল। বলল তো বুনো শুয়োরের মাংস। অপূর্ব স্বাদ। এত নরম আর এত মিষ্টি কোনো মাংস জীবনে খায়নি অরিত্র।

কাঠের সিলিং থেকে একটা লোহার হুক দিয়ে শুয়োরের দাবনার টুকরোটা ঝোলানো ছিল। হলুদ মাখানো বেশ পুরুষ্টু একটা টুকরো। অরিত্রর মনে হল, মানুষের উরুর সঙ্গে খুব একটা তফাত নেই। লোকটা যখন পুরো মাংসটাই কড়াইতে চাপাচ্ছিল, তখন সে আপত্তি করে বলেছিল, "পুরোটা খরচা করছেন কেন? আমি খুব অল্প খাই। অর্ধেকটা রেখে দিন।"

তাতে লোকটা বেশ ফুর্তিবাজের মতন বলেছিল, "এইটুকু লাক্সারি আজ করতেই পারি। কালকেই তো আবার শুয়োর শিকার করব। চামড়া মাংস সবই আবার পেয়ে যাব।"

"শুয়োরের চামড়া! কাজে লাগে?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল অরিত্র।

লোকটা মাংসের ঝোলে কীসব সুগন্ধী হার্ব-টার্ব মেশাতে-মেশাতে বলেছিল, "লাগে বই-কি। ওই যে চাদরটার ওপরে বসে আছেন, এই যে আমার পোশাক— সবই তো শুয়োরের চামড়া দিয়ে বানানো।"

অরিত্রর বিশ্বাস হয়নি। সে কিছুদিন একটা লেদার-এক্সপোর্ট ফার্মে চাকরি করেছিল। তখনই শুনেছিল, শুয়োরের চামড়া থেকে ঘন আর শক্ত লোম ছাড়ানো এক অসম্ভব ব্যাপার; তাই ওই চামড়া দিয়ে কোনো কাজ হয় না। সে যা-ই হোক, মাংসটা খেতে খাসা হয়েছিল এবং অনেকটা খেয়ে ফেলেছিল বলেই অরিত্র সেই রাতে ঘুমিয়েও পড়েছিল তাড়াতাড়ি।

ঘুমটা যখন ভাঙল তখনও ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার। ফায়ার-প্লেসের অঙ্গারের আভা ছাড়া আর কোনো আলো ছিল না। সেই অল্প আলোতে কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছিল না। লোকটা অন্যদিকে ঘুরে শুয়েছিল। অরিত্র সাবধানে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের একমাত্র জানলাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জানলার পাল্লাটা সামান্য ফাঁক করে দেখল, তখনও প্রায় বৃত্তাকার চাঁদটি আকাশের এককোণে ঝুলে রয়েছে। পূর্ণিমার পরে প্রতিপদের চাঁদ।

অরিত্র চিন্তা করল, এমন অসময়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল কেন? উত্তরটা বোধহয় সে আন্দাজ করতে পারছিল। আসলে তখন প্রায় সবকটা ইন্দ্রিয় দিয়ে অরিত্র অনেকগুলো অস্বাভাবিকতাকে স্পর্শ করতে পারছিল। তবু ব্যাপারটাকে ভালো করে বোঝবার জন্যে সে ঘরের দরজা খুলে বাইরে এল। জ্যাকেটের হুডটা মাথার ওপরে তুলে দিয়ে, সেই পুরোনো মেশিনটার পাশ কাটিয়ে স্টান্টেড রডোডেনড্রনের বনের দিকে এগিয়ে গেল।

হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই, মাটিটা মাঝেমাঝে কেঁপে উঠছে। ভূমিকম্প? না। ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা রয়েছে অরিত্রর। ভূমিকম্পে মাটি দুলে ওঠে। এখন মাটি দুলছে না— মোচড়াচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ সময়ের ব্যবধানে একবার করে যেন মুচড়ে উঠছে মাটিটা আর তখনই অনেক দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে। যেন কেউ তীব্র আশ্লেষে আওয়াজ করছে 'উমমম! আঃ! আহহ! উমমমম!'

নারীর কণ্ঠস্বর।

এমন কত রাতে জয়িতার নগ্ন পিঠে হাত রেখে অরিত্র এই মোচড় অনুভব করেছে। কত রাতে কামাতুরা জয়িতা তার বুকের পশমে মুখ ডুবিয়ে ঠিক এইভাবে গভীর আশ্লেষে তাকে ডেকেছে— 'উমমম! আঃ! আহহ! উমমমম!'

এরপর আর কিছুই অরিত্রর হাতে রইল না। এক মায়াপাশ তাকে টেনে

নিয়ে চলল— যেভাবে হরিণকে টানে অজগরের চোখ।

কতক্ষণ ধরে যে রডোডেনড্রন-বনের ভিতর দিয়ে সে হেঁটেছিল, তা জানে না অরিত্র। হঠাৎই বনের যবনিকা সরে গিয়ে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই উল্কাপাতের মাঠ। মরা জ্যোৎস্নায় বৃত্তাকার জমিটাকে মনে হচ্ছিল এক রঙ্গমঞ্চ, যেখানে অভিনেতা বলতে অরিত্র একা।

না, আরেকজন ছিল। সেই বিশাল উল্কা-পাথর।

সে এখন জীবন্ত। নাকি চিরকালই জীবন্ত ছিল— শুধু অরিত্র আগে বুঝতে পারেনি?

ঘোরলাগা চোখে অরিত্র পাথরটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটা 'হিট'-এর কথা বলেছিল না একবার? এই কি সেই মিলন-উত্তাপ? গাঢ়োয়াল-হিমালয়ের মধ্যরাতের শৈত্যকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, এক আশ্চর্য আরামদায়ক উষ্ণ তরঙ্গ জড়িয়ে ধরছিল অরিত্রকে। অরিত্র অবাক হয়ে দেখল, পাথরটার রেশম-চিকন গায়ে অজস্র ঘামের ফোঁটা জড়িয়ে আছে। কিছু-কিছু ফোঁটা টুপটুপ করে মাটিতে ঝরে পড়ছিল।

অরিত্র পাথরটাকে প্রদক্ষিণ করে উলটোদিকে চলে গেল। কে যেন তাকে টেনে নিয়ে গেল। আগের দিন সকালে যখন লোকটার সঙ্গে এসেছিল, তখন এদিকটায় আসেনি।

চাঁদের আলোয় অরিত্র দেখল, পিছনদিকের সেই মসৃণতা, সেই দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য এদিকেও মজুত। এইদিকে কালোপাথরের নিটোল দুটি স্তম্ভ একটু আনত-ভাবে মাটি থেকে ওপরের দিকে উঠে গেছে। আকারে প্রকারে দুটি স্তম্ভই একেবারে একরকম। আর সেই দুই স্তম্ভ মাটিতে যেখানে মিশেছে সেখানে এক আশ্চর্য পাথরের ব্লক।

ব্লকটা এইজন্যেই আশ্চর্য যে, আকৃতিতে সেটি এক নিখুঁত সমবাহু ত্রিভূজ, একটা উলটোনো ত্রিভূজ, যার ভূমি ওপরের দিকে আর শীর্ষ নীচে। আরও আশ্চর্য যে, পুরো উল্কাপাথরটার গায়ে আর কোথাও এক-কুঁচি শ্যাওলা না জন্মালেও, এই ত্রিভূজাকৃতি ব্লকটা একরকমের গাঢ় বাদামি গুল্মের ঘন আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে গেছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, যদি ব্লকটাকে একটা ত্রিভূজ বলেই ধরা হয়, তাহলে তার ঠিক মধ্যরেখা বরাবর, শীর্ষবিন্দু থেকে ভূমির দিকে অনেকদূর অবধি খাড়া উঠে গেছে একটা সরু ফাটল।

অরিত্রর মনে হচ্ছিল সে যেন একটা লোহার পেরেক আর ওই ফাটলটা বিদ্যুত-চুম্বক। অসম্ভব জোরালো এক আকর্ষণে অরিত্র আরও কিছুটা এগিয়ে গেল ওইদিকে আর তখনই সে দেখতে পেল ফাটলটার নীচের দিকে একটা সংকীর্ণ গুহামুখ।

সে আর কিছু দেখার কিংবা ভাবার আগেই পাথরটা একবার প্রবলভাবে